

উপসংহার

“এই সভ্য, হাস্যলাস্যময় ভদ্রলোকদের ঘরে—

রাখা ফ্রিজে মাছ-মাংসে, ফলমূলে, বিবিধ মিষ্টানে

একদিন অকস্মাৎ দুর্গন্ধ বেরবে...”^১

কবি রফিক আজাদ সংশয় প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু আখতারুজ্জামান বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়কে প্রত্যক্ষ করে বিষাদময় রূপকে তাঁর ছোটগল্পের অন্তরে প্রকাশ করেছেন। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে মার্কেনটাইন ভাবাদর্শ, ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লব, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শিল্প বিপ্লব প্রভৃতি সকলের হাত ধরে বুর্জোয়া সভ্যতা গঠনের মাধ্যমে ইউরোপে উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমাজের বিকাশ দেখা যায়। এই শ্রেণি শাসক এবং শাসিতের মাঝখানে অবস্থান করে; যারা শ্রমের উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সরাসরি যুক্ত নয়। এই পরোক্ষ নির্ভরশীল সমাজ আবার তারই উপর নির্ভরশীল, যারা মালিক শ্রেণির স্বার্থে সর্বদা থাকে নিযুক্ত; কিন্তু মালিক স্বার্থে এরা নিজেদেরকে যতই নিযুক্ত রাখুক না কেন নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলে, শাসক সিংহাসনও বদলে দেবার দৈবীশক্তি অন্তরে সংগোপনে রাখার ক্ষমতা এদের আছে। এর মূল কারণ সন্ধানে সহজেই বোঝা যায় শিক্ষা, চিন্তা, মনন, সংস্কৃতি, রুচি প্রভৃতি ব্যাপারে এরাই হল দেশের মূল কাঠামো। সাংস্কৃতিক রুচি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা হল মধ্যবিত্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য-এরূপ মন্তব্য করেন সমাজবিজ্ঞানী নজরুল করিম, কারণ এই দুই বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে এদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। উনিশ শতকের প্রথমভাগ থেকে ইংল্যান্ডের হাত ধরে মধ্যবিত্ত তাদের উপনিবেশ ঔপনিবেশিক স্বার্থে ভারতবর্ষের অকৃপণ হৃদয়ে থাকা বসায়। বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে আমরা হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়কেই বুঝি। আসলে ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজীর বাংলা আক্রমণ এবং ১৭৫৭ সালে সিরাজের পতন প্রায় এই দীর্ঘ ৫৫০ বছরের রাজত্বে মুছে যায় মুসলমানদের স্ববাসী, পরবাসীর প্রশ্ৰুতি। মেকলের কেরাণীগিরির ইংরেজি শিক্ষা, রেলপথ, চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত, চা-শিল্প, পাট শিল্পের প্রসার ভারতকে বণিক সভ্যতার আঁচ দেয় কিন্তু সামন্ত প্রথাকে ভাঙ্গা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ভারতের মূলধনের প্রধান অবলম্বন কৃষি ও জমিদারি, তা চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের ফলে শুয়ো পোকাকার গুটি কাটিয়ে রূপ নেয় ব্যবসাতে। এই ভাবেই গড়ে ওঠে এক অসুস্থ

সমাজব্যবস্থা। গুটিকতক দালাল হয়ে ওঠে মুৎসুদ্দি আর এখানেই তারা হয়ে ওঠে পয়সার অধিকারী। শহরে বসবাসকারি জমিদারের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে গ্রামের জমিদার ও প্রজার মধ্যে বাড়তে থাকে 'Middle Man'। আর এই ভাবেই আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত বৃক্ষ তার শিকড় বিস্তার করতে থাকে বিন্দু বিন্দু প্রতীক্ষার গাঢ় প্রতীজ্ঞা নিয়ে। এই শ্রেণি সম্পর্কে মাকর্সের বক্তব্য বিস্মরণ হলে আমাদের চলে না—

“এই শ্রেণীটি সাধারণত অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল থেকে উচ্চবিত্তদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।”^২

ভারতবর্ষেই এই শক্তি প্রথমে ইংরেজ শক্তির সহায়ক রূপে কাজ করে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এসব ব্যাপারে কাজ করত মূলত হিন্দুরা। মুসলমানেরা তাদের রাজত্ব হারানোর অভিমানে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে, ১৮৩৭ রাজভাষা পরিবর্তনে অথবা বাঁশের কেলা প্রভৃতি বিদ্রোহে; শাসক শ্রেণির বিরাগ ভাজনের ফলে মূলত থাকে পিছিয়ে। তবে কয়েকজন বড় বড় নবাব সেই সময় পয়সাওয়ালা বিত্তধারী থাকলেও তারা মূলত বিলাস ব্যাসনে ও ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে থাকে মগ্ন। পরে সৈয়দ আমীর আলি ও আব্দুল লতিফের হাত ধরে এবং ১৮৮০-র রেলপথ স্থাপনের এক দশকের মধ্যে পাট শিল্পের প্রভূত উন্নতির ফলে গঠিত হয় মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ। সিপাহী বিদ্রোহের পর মুসলিম সমাজের প্রতি ইংরেজরা একটু নরম হয়। ১৮৮০ তে ইংরেজরা মুসলিমদের শিক্ষা ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৯০৬-এ মুসলিমদের ‘মুসলিম লীগ’ গঠিত হবার ফলে মুসলিমদের দাবিদাবার এক সংঘবদ্ধ রাজনীতির ক্ষেত্র তৈরি হয়। ১৯২১-এ গড়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রভৃতির ফলে গড়ে ওঠে মুসলিম মননধর্মী মধ্যবিত্ত সমাজ।

‘... হত্যাকারীদের কোনো মানচিত্র থাকে না, নেই।’^৩

দুই বিশ্বযুদ্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনৈতিক জটিলতা, বেকারত্ব, শ্রমিক অসন্তোষ, ‘ল অ্যাণ্ড অর্ডারের’ ভাওতাবাজি ইত্যাদি দেখা দেয়। ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ইংরেজদের প্রতি আস্থা হারায়। চারদিকে তৈরি হয় গভীর অসন্তোষ। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় রাজনীতি ভাগ হয় দুই পক্ষে ‘হিন্দু জাতীয়তাবাদী’ ও ‘মুসলিম জাতীয়তাবাদী’। একদিকে হিন্দুরা ছিল অনেক এগিয়ে কারণ তারা ইংরেজি শিক্ষা পায় অনেক আগে। তাদের আধুনিক চিন্তাধারার ভিত্তি গড়ে ওঠে মূলত বলা যেতে পারে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের হাত ধরে। অপরদিকে

অনেক পরে জাগ্রত হওয়া মুসলমান মধ্যবিত্ত ভাবে এক নতুন দেশের কথা, যেখানে তাদের সব সমস্যার সমাধানের স্বপ্ন দেখায় ইংরেজরা ও তৎকালীন নেতৃবৃন্দরাও-বলাই বাহুল্য, হিন্দুদের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবও। তাই ১৯১১-এ বঙ্গভঙ্গ রোধ হলেও ১৯৪০-এ ওঠে ভারত ভাগের কথা। ১৯৪৬-এর দাঙ্গা এই ভাগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পুরোমাত্রায় দখলদারি করে। ১৯৪৭ সালের ফলাফল-স্বাধীনতার সাথে ভাগ হয় ভারত ও পাকিস্তান (পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান)। স্বাধীনতার আনন্দের সাথে ভাগ করে নিতে হয় অঙ্গচ্ছেদের বেদনাটুকুও।

‘মুসলিম’ মানসে তৈরি হওয়া পূর্ব পাকিস্তান আরেক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, বাংলা না উর্দু-মাতৃভাষা কি হবে এই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের? আসলে এই প্রশ্নের সাথে জড়িয়ে রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতির কথাটিও, বলতে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিকবাদের প্রশ্নটিও। আজ পূর্ব পাকিস্তান পরিণত হয়েছে বাংলাদেশে। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর একটি মস্তব্য মনে আসে ‘কাব্য ম্যাজিক হতে পারে, কিন্তু সমালোচনা লজিক হতে বাধ্য।’^৪ কাব্য জগতের ম্যাজিক নিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজ তাঁর সুখী গৃহকোণে দাম্পত্যজীবন কাটাতে ব্যস্ত থাকেনি। আর থাকেনি বলে সমালোচনার লজিক তাদের গৃহ প্রাঙ্গণ থেকে বের করে আনে। এবং এই ভাবেই স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের মধ্য দিয়েই তৈরি হয় বাংলাদেশ।

“এই কাঁটাতার-ঘেরা জীবনেরও হয়তোবা আছে প্রয়োজন।

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে আমিও

আজ বুড়ো হ’য়ে গেছি; নির্ধারিত এই পরিণতি

প্রাণী মাত্রে কাম্য জানি।”^৫

আখতারুজ্জামান বয়সের ভারে জীবন পরিণতির দিকে এগিয়েছেন কিন্তু তিনি কাঁটাতার ঘেড়া মধ্যবিত্ত মানসের প্রয়োজন মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। পরিণতিহীন সময়ের বুকে মধ্যবিত্তের অবক্ষয় তাঁকে ঘুমোতে দেয়নি কারণ তিনিও মধ্যবিত্ত জীবনে বেড়ে উঠেছিলেন। মধ্যবিত্ত সমাজের অকাল প্রয়াণ হোক, তা তিনি চাননি; আর চাননি বলেই কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন। যাইহোক কেমন আছে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে? উত্তর খুঁজতে সহজেই সওয়ার হওয়া যায় ইলিয়াসের লেখনী পিঠে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর ছোটগল্পে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের সেই স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ, তাঁদের রাজনীতি, অর্থনীতি,

সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বিন্যাসের দিকটি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি তাঁর গল্পে স্ল্যাং (যেহেতু তা বর্তমান মানুষের জীবনের বাইরে নয়), হিউমার, উইট, ফান, তীক্ষ্ণ অকপট সমাজ-সমালোচনা ইত্যাদি খুব নিখুঁত ও নৈব্যক্তিতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন। মানুষকে কোনো আইডিয়া বা দলীয় চশমার দৃষ্টিতে বা কোনো খিত্তির বাহক হিসেবে দেখতে নারাজ তিনি। কোনো আদর্শ নয় সাধারণ মানসিকতার মাধ্যমেই তিনি মানুষের সমতার কথা বলেন। তাঁর কথাসাহিত্যে শ্রমিক চরিত্রেরা কোনো নেতা বা আদর্শবাদী চরিত্র নয়। ভালমন্দ সব মিলিয়েই তারা মানুষ (যেমন ‘খিজির’ চরিত্র ‘চিলেকোঠার সেপাই’)। তিনি মানুষের সমাজের ও তাঁর সময়ের ‘রিয়ালিটি’কে ধরতে চান—বাস্তব যা শুধু আমরা দেখি তা না, যান্ত্রিক বাস্তবতাও নয়, মানুষের আশা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, তার যৌনতা—সেটিও তার শ্রেণি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (যেমন— ‘উৎসব’ গল্পের আনোয়ার), এই সবটা নিয়েই। চাঁচাছোলা ভাষা, কখনও বা কৌতুক এসব দিয়েই নির্মিত হয় তাঁর গল্পের বয়ান। গল্পকে কখনো তিনি আবেগাল্লুত করে দেখাতে চান না। আর তাই করুণ দৃশ্যের মধ্যেও কোনো চরিত্রকে প্রবেশ করিয়ে সেই Situation টাকে তিনি করেন Neutralize (যেমন, ‘পায়ের নীচে জল’ -এর কেলামতের খোঁড়া ছেলে)। তিনি তাঁর গল্পের চরিত্রের কর্মের পেছনে সেই সমাজের system টাকে লক্ষ্য করেন। তাই তাঁর কোনো গল্পই ‘ইচ্ছাপূরণের’ গল্প হয়ে ওঠে না বরং তিনি গল্পে দেখান বর্তমান সমাজের বলতে গেলে বর্তমান বাংলাদেশের ‘ফোঁড়া’, ‘অসুখ-বিসুখ’, ‘দুখেভাতে উৎপাত’, ‘অপঘাত’ আর ‘কান্না’কে। একথা ঠিক, যে কোন সমাজের চালিকা শক্তি হল মধ্যবিত্ত সমাজ। বলাই বাহুল্য বাংলাদেশেরও তাই। তাঁর গল্পের মধ্যে আমরা পেয়ে যাই ‘দোজখের ওম’ সমাজের ধারক শক্তি মধ্যবিত্তের সংকট, গ্লানি, যৌনতা, অর্থনীতি, নগরকেন্দ্রিকতা, রাজনীতি, পারিবারিক-সম্পর্কের বিকৃতিগুলিও। এককথায় বাংলাদেশের ‘মধ্যবিত্ত : ভাসমান, শৌখিন, ক্ষয়িষ্ণু’ অবস্থা। সমাজের দর্পণ হয়ে তিনি তুলে ধরেন বাংলাদেশের সমাজচিত্র। আবার কিছু গল্পে তা বাংলাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে চলে যায় বিশ্বের সমস্যাতেও (যেমন, ‘যোগাযোগ’ গল্পে ‘রোকেয়া’ ও তার অসুস্থ ছেলে)। বিশ্বের দরবারে পৌঁছেছে বলেই কথাসাহিত্যিক তথা প্রাবন্ধিক হাসান আজিজুলের মুখে আমরা শুনতে পাই—

‘ইলিয়াসের সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে সম্পূর্ণ গল্প ‘যোগাযোগ’।

তাঁর লেখায় যতোরকম খুঁৎ আমি উল্লেখ করেছি তার প্রায়

একটাও আমি এই গল্পটি সম্পর্কে উচ্চারণ করবো না। এই
গল্পে কোন ছবিই অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় নয়, লক্ষ্য সম্পর্কে
কোথাও দ্বিধা নেই, ভিতরের সূত্রগুলি ন্যায়বদ্ধ।”^৬

১৯৭১-এ মুক্তি যুদ্ধের পর আজকের বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় হিসেবে ব্যবহার
করতে হয় ‘বাঙালি’ ‘মুসলমান’-এই শব্দ দুটিকে। মুসলমান জাতি হিসেবে যেমন তারা গড়ে
নতুন দেশ পূর্ব পাকিস্তান। ঠিক তেমনি ‘বাংলা’ ‘বাঙালিত্ব’ কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের রূপ
পায় বাংলাদেশে। তাই বাঙালি মুসলমানদের মনে এখনও মুরগি আগে না ডিম—এই
রকম প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—তারা আগে বাঙালি না আগে মুসলমান। আর বলাবাহুল্য
এই টানা পোড়েনে সবচেয়ে বেশি ভোগে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত। আহমেদ হুফা ‘বাঙালি
মুসলমানের মন’ নামক প্রবন্ধে দেখান যে, মধ্যবর্গ সুবিধা অনুসারে কখনও বাঙালি কখনও বা
মুসলমান। হাওয়া যেদিকে প্রবাহিত হয় সে সেদিকেই থাকে। ঘরে সাম্প্রদায়িক, বাইরে সেকুলার।
লেখায় সেকুলার, জীবনে ফ্যাসিস্ট। কথায় ধার্মিক, জীবন যাপনে অধার্মিক। সে আধুনিক হবার জন্য
সাজে বাঙালি, আবার মুসলমানিত্বকে গুটিয়ে রাখে লেজের মতো করে।^৭ আহমেদ হুফার মন্তব্যের
মধ্যে ফুটে ওঠে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি। ইলিয়াসের মতে ‘বাংলা
ছোটগল্প আর ছোটকথা’ বলে না, বলে আধুনিক জীবন জটিলতার কথা, তবে কোনো তত্ত্বকথার
মোড়কে নয়। নিজের লেখায়ও নিজের অন্তঃদৃষ্টি দিয়ে যে সমাজ অসংলগ্নতাকে চিত্রাংকিত
করেছেন, সেখানে তিনি শিল্পী, তাত্ত্বিক কিংবা সংস্কারক নন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের
প্রশ্নগুলি—

“গত চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছরের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে শুরু করে
এখানে যে পরিবর্তন ঘটে কোথাও তার তুলনা পাওয়া কঠিন।
আড়াই বছরের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো পালটানো দু’বারই মানুষের
প্রত্যাশা ছিল আকাশচুম্বী—দু’বারই আশাভঙ্গ হয়েছে চূড়ান্ত
রকম, সমস্ত সমাজে। মানুষের মানসিকতায় যে দারুণ রকমের
ওলটপালট ঘটল তার কতটা চিহ্ন ছোটগল্পের শরীরে দেখতে
পাই?...।”^৮

না বললেই নয় আমরা উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির সব উত্তর পাই তাঁরই ছোটগল্পের মধ্যে। তাঁর

গল্পে আনোয়ার (‘উৎসব’), ওসমান (‘প্রতিশোধ’) আসগর (‘যুগলবন্দী’), রোকেয়া (‘ফেরারী’), ইয়াকুব (‘পিতৃবিয়োগ’) কামালউদ্দিন (‘দোজখের ওম’), জাহাঙ্গীর (‘প্রেমের গল্প’) প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে যেমন দেখতে পাই আধুনিক জীবন জটিলতা ও মধ্যবিত্তের দ্বিধাদ্বন্দ্ব। ঠিক তেমনিভাবে ‘মিলির হাতে স্টেনগান’, ‘খোঁয়ারি’, ‘জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল’, ‘দুখেভাতে উৎপাত’, ‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’ প্রভৃতি গল্পে দেখা যায় বর্তমানকালীন বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থানকেও। ইলিয়াসের ভাবনার স্বপক্ষ সমর্থনের পরোক্ষ ইঙ্গিত আমরা হাসান আজিজুল হকের ‘মধ্যবিত্তের বিত্তহীন সাহিত্য’ প্রবন্ধে লক্ষ্য করতে পারি—

“মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, সে সাহিত্যে এই শ্রেণীর মানসিকতা তো প্রতিফলিত হবেই। একটা প্রধান লক্ষণের কথা তোলা যাক। আজকের কবিতা, গল্প, উপন্যাস পড়তে গেলেই যে মূল বৈশিষ্ট্যটি কিছুতেই পাঠকের নজর এড়ায় না তার নাম হচ্ছে হতাশা। যেভাবেই পরিবেশিত হোক, যত শিল্পকর্মই ফুটিয়ে তোলা হোক, আমাদের সাহিত্যের স্থায়ীভাব যে হতাশা তাতে সন্দেহ করা চলে না। কোথা থেকে আসছে এই হিম শীতল হতাশার স্রোত? কোন্ শ্রেণীর গভীর তল থেকে?”^৯

ইলিয়াস সাহেবও হতাশার উৎস সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। ডুবুরির কৌতুকপূর্ণ চোখের অন্বেষণে ইলিয়াস খুঁজে পেয়েছিলেন মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়কে। আর এই অবক্ষয়িত রূপ থেকেই আমরা হতাশার বীজকে অনুসন্ধানে তুলে আনতে পেরেছি বলে মনে হয়। তবে জীবনের শেষ পরিণতি হতাশায় পূর্ণ হয় বলে মনে হয় না; এই না হবার জন্যই ইলিয়াস—রাণা (‘মিলির হাতে স্টেনগান’) জাফর, ফারুক, ইকবাল (‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’) চরিত্রদের মধ্য দিয়ে উঠতি স্বার্থান্বেষী মধ্যবিত্তের ক্রিয়াকলাপকে দেখানোর পাশাপাশি দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষের ঘুড়ে দাঁড়ানোর আশ্বাসটুকু শোনাতে ভোলেননি। ‘দোজখের ওম’ গল্পে কামালউদ্দিন বৃদ্ধ বয়সে দেখে একের পর এক মৃত্যু, দেখে সন্তানের রেষারেষি ও স্বার্থপরতা, কিন্তু জীবনের শেষে এসেও

“ঠোঁট, জিভ ও গলার সচল, অচল ও নিমচল টুকরাগুলো
জোড়াতালি দিয়ে কামালউদ্দিন একটি লাল-বলকানো ছফার

ছাড়ে, ‘তর চাচারে কইস, দাদায় অহনতরি বাঁইচা আছে।’^{১০}

জানি মাখবীলতা থাকলেও আর প্রাণ থাকে না ‘খোঁয়ারি’র বাংলাদেশে। ফলে—

“দুঃখের সিমেন্ট বালি ইট কাঠ রডে

তৈরি হচ্ছে এই বাড়ি-উঠছে বাড়িটি

মাথা-উঁচু মেহগনি গাছটি ছাপিয়ে;

ভিত্তিটি মজবুত খুব : দুঃখের পাইলিং

হয়েছে যে দীর্ঘদিন ধ’রে।”^{১১}

দুঃখের নিজীব মানবী রূপগুলি আমাদের সামনে ইলিয়াস কলমে উঠে আসে। তবে দেওয়ালে পিঠ পড়লেও ‘পায়ের নীচে জল’ আসলে আলতাফ মৌলবীদের বুঝতে থাকে না বাকি—

“সাবধান নাগরিকগন,/সময় আসছে ধেয়ে-খারাপ সময়।”^{১২} ইলিয়াস মানুষকে সাবধান হতে বলে যাতে করে তারা বান ভাসি হয়ে নাগরিক জীবনের বিপন্ন বিস্ময়ে নিজেদের মুদ্রা দোষে একা হয়ে না যায়। গল্প পটে তাই তিনি জানান—

“বাঁধ কখন ফাঁটে বিশ্বাস আছে? বর্ষাকালে ভিজে মাটি মানুষের

পদভারে ফাঁক হতে কতক্ষণ। তারপর সপ্তস্রোতে উনপঞ্চাশ

তরঙ্গ তুলে যমুনা গ্রাস করতে এসেছে এইসব গ্রাম, ধানী জমি,

পাট খেত, স্কুলের দালান, নতুন সার্কল অফিস, সাব রেজিষ্ট্রি

অফিস, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ইউনিয়ন কাউন্সিলের টিনের

ঘর, সবুজ ও লাল পতাকা শোভিত লাল রঙের থানা।”^{১৩}

গল্প বিশ্বে বিন্দু বিন্দু দৃঢ় প্রতীজ্ঞা জমানো গাঢ় লেখনী নিয়ে ইলিয়াস যেভাবে এগিয়ে গেছেন তাতে করে তাঁর নিজস্ব বক্তব্যের মধ্যেই ফুটে ওঠে সময়ের আখ্যান তত্ত্ব—

“বেঁচে থাকা একটি বড়ো কাজ, সকলের সঙ্গে বাঁচাটা সবচেয়ে

জরুরি এই কথাটি সবাইকে উপলব্ধি করিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে

বেশি জরুরি।... লেখক যখন অবক্ষয় ও নিঃসঙ্গতার কথা বলেন

তখনো তিনি ব্যক্তিকে আত্মহত্যা করার পরামর্শ দেন না, বরং

পরোক্ষভাবে হলেও এই কথাই বলেন যে, আরো পাঁচজনের

সঙ্গে একাত্ম হয়ে সংবদ্ধভাবে এই অবস্থা থেকে রেহাই পেতে

পারেন—জীবন এতে অর্থময় হয়ে ওঠে। ব্যক্তিকে স্থাপন করতে
হয় সমাজের প্রেক্ষিতেই ব্যক্তির ভিতর দিয়ে সমাজ বিকশিত
হয়, আবার সমাজ গড়ে তোলে ব্যক্তিকে। সামাজিক অঙ্গীকার
বোধ না করলে কোনো লেখকের পক্ষে এই সত্যটি প্রকাশ করা
সম্ভব হয় না।”^{৪৪}

ঢাকার মাওলা ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত হয় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রচনা সমগ্র। তাঁর
রচনা কর্ম নিতান্তই কম ছিল না ফলত রচনাকর্ম পাঁচ খণ্ডে স্থান প্রাপ্ত হয়। এই পাঁচ খণ্ডে
ইলিয়াস সাহেব পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইলে অবস্থানরত মধ্যবিত্ত জীবনের সমগ্র রূপের পাশে
অবস্থান করে, যেন ‘দূরে এক কোণে পলাশের ডালে আগুন লেগেছে চাঁদে।’^{৪৫} তিনি অবক্ষয়িত
রূপের সার্বিক প্রকাশ গল্প ভূবনে প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁর এই অবক্ষয় চিত্রকে যেন
সর্বদেশের সর্বকালের মানবমনের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়। ইলিয়াস অবক্ষয়ের চিত্র ফোঁটালেও
মানবের মেলবন্ধনেই অস্তিম বিশ্বাসী ছিলেন, আর তাই না আমরা তাঁর প্রতিটি গল্পের অস্তে
একটিই সুরকে অনুভবে বোধ করি—

“মিলনের রক্তস্রোত রাজপথ প্লাবিত করে
জমাট রক্তের বাঁধ-ভাঙা জোয়ার-আনে
মিলনের রক্তে চিকিৎসক শিল্পী কবি সাংবাদিক
ছাত্র শিক্ষক পেশাজীবী মহামিলনের মোহনায় মিশে যায় মিলনের
রক্তে আবার জাগায়
লাঠিগুলি টিয়ার গ্যাসে সন্ত্রস্ত বাংলাদেশ
... মিলনের রক্তে মুক্তির ইতিহাস
মিলনের মৃত্যু নেই চির অমর মিলন।”^{৪৬}

কিন্তু সংশয় ইলিয়াসের কাটে না মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয় তাকে ক্লান্ত করে রিক্ত করে;
তিনি নিজের মুদ্রাদোষে আর সকলের থেকে মধ্যবিত্ত জীবন চিত্রায়ণে বেরিয়ে পড়েন হিরো
কলমের পিঠে সওয়ারী হয়ে।

তথ্যসূত্র :

১. আজাদ রফিক : ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, ‘সশস্ত্র সুন্দর’, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭, সংস্করণ - ২০০৭, পৃ. ৯৮।
২. ভুইয়া গোলাম কিবরিয়া : ‘বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের ক্রমবিকাশ’, জুন, ১৯৯৫, পৃ. ৪।
৩. মাহমুদ আল : ‘কবিতা সমগ্র’ ‘হত্যাকারীদের মানচিত্র’, অনন্যা, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ২১২।
৪. চৌধুরী প্রমথ : ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ’ ‘চিত্রাঙ্গদা’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মুদ্রণ ৭ আগস্ট, ১৯৬৮, পৃ. ১৭৫।
৫. আজাদ রফিক : ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ ‘একজন বৃদ্ধ বলেছেন’, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭, পৃ. ৬২।
৬. হক হাসান আজিজুল : ‘কথাসাহিত্যের কথকতা’ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ’, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১, পৃ. ৮৩।
৭. মোর্শেদ মাহবুব : ‘আহমেদ ছফার ‘বাঙালি মুসলমানের মন’’, লোক অনিকেত শামীম সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারি, ২০০২, পৃ. ১০২।
৮. ইলিয়াস শাহদুজ্জামান : ‘জীবনের জঙ্গমতা : লেখকের উপনিবেশ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস’ (তিনটি সাক্ষাৎকার ও দুটি রচনার সংকলন), জুন, ২০০৫, পৃ. ১০৪।
৯. হক হামান আজিজুল : ‘প্রবন্ধ সমগ্র -১’ ‘মধ্যবিত্তের বিত্তহীন সাহিত্য’, অশ্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১১, পৃ. ২৭২।
১০. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : ‘রচনা সমগ্র-১, ‘দোজখের ওম’, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৩১৮।

১১. আজাদ রফিক : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' দুঃখের নির্মাণ' প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।
১২. প্রাগুক্ত : 'সময় আসছে ধৈয়ে', পৃ. ২০৭।
১৩. ইলিয়াস আখতারুজ্জামান : 'পায়ের নীচে জল', প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২-১৩।
১৪. ইলিয়াস শাহদুজ্জামান : 'জীবনের জঙ্গমতা : লেখকের উপনিবেশ',
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস' প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।
১৫. বসু বুদ্ধদেব সম্পাদিত : 'আধুনিক বাংলা কবিতা', 'ফাল্গুন', এম. সি. সরকার
অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মুদ্রণ জুলাই,
১৯৮০, পৃ. ২১১।
১৬. রায়হান মোহন : 'কবিতা সমগ্র' 'মিলনের মৃত্যু নেই', অরিত্র, ঢাকা,
প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০১, পৃ. ২৮২।